ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা

'প্রস্তাবনা' (preamble) বলতে মূলত সংবিধানের ভূমিকা বা মুখবন্ধকে বোঝায়। এর মধ্য দিয়ে সংক্ষেপে সংবিধানের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সংবিধানের আদর্শ ও প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।

'প্রস্তাবনা'—সংবিধানের অংশ

অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা—সার্বভৌম-সমাজতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক-সাধারণতন্ত্র

main pol. eco, social ideas are included in preamble

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা দ্বারা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মূলনীতিসমূহকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই নীতিগুলি প্রকাশের মধ্য দিয়ে ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সরকারি কাঠামোর রূপটিও প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, ভারত হল একটি "সার্বভৌম-সমাজতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক-প্রজাতন্ত্র"। যখন সংবিধানটি প্রথম প্রবর্তিত হয়, তখন প্রস্তাবনায় "সার্বভৌম-গণতান্ত্রিক-প্রজাতন্ত্র"—শব্দগুলিই নিহিত ছিল। কিন্তু 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'সমাজতন্ত্র'-এই শব্দ দুটির কোনো উল্লেখ ছিল না। 1976 খ্রিস্টাব্দের 42তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ওই শব্দদুটি যুক্ত করা হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনায় প্রকাশিত এই নীতিগুলি স্বাধীনতার অস্তিত্ব ও তার স্বরূপটি প্রকাশ করে।

সার্বভৌম Sovereign

সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি 'সার্বভৌম' রাষ্ট্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হল—ভারত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিক থেকেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং, অভ্যন্তরীণ দিক থেকে ভারত একটি সার্বভৌম দেশ—এ কথা বলার অর্থ হল, ভারতের জনগণ যেমন রাজনৈতিক দিক থেকে সার্বভৌম, তেমনই আইন প্রণয়নের দিক থেকে সংসদও সার্বভৌম। কারণ, সংসদের সদস্যগণ ভারতের জনগণ দ্বারা

internal + external sovereignty

People are politically sovereign, Parliament is sovereign with respect to law making, members of parl are elected by people.

নির্বাচিত হন। সংসদের জনপ্রিয় কক্ষ হল লোকসভা; এই কক্ষের সদস্যগণ নির্বাচিত হন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে। এদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই সরকার গঠন করে। এই সরকার আবার তার কার্যাবলির জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধি সভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে। যেহেতু, ভারতের অভ্যন্তরীণ নীতি-নির্ধারণ বা অন্য কোনো বিষয়ে কোনো রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে না সেহেতু, ভারত অভ্যন্তরীণ দিক থেকে সার্বভৌম। আবার বাহ্যিক সকল বিষয়ে অর্থাৎ, পররাষ্ট্র সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ, বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতি কীরূপ মনোভাব পোষণ করবে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে একমাত্র ভারতই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী।

India can acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favour of a foreign state. Free to decide foreign policy.

ভারত কমনওয়েল্থের একটি সদস্যরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের রাজা বা রানি হলেন কমনওয়েল্থের প্রতীকী প্রধান। তাই সমালোচকদের মতে কমনওয়েল্থের সদস্যপদ দ্বারা ভারতের সার্বভৌম মর্যাদা বিনষ্ট হয়েছে। কিন্তু সমালোচকদের এই ধরনের মন্তব্য সঠিক নয়। কারণ, [1] কমনওয়েল্থ হল একটি স্বেচ্ছামূলক সংঘ এবং এই সংঘে ভারতের যোগদানও স্বেচ্ছামূলক। স্বেচ্ছামূলকভাবে ভারত কমনওয়েলথে যোগদানের অর্থ হল—ভারত এর আজীবন বা স্থায়ী সদস্য নয়। যে-কোনো সময়ে ভারত এই সদস্যপদে ইস্তফা দিতে পারে। [2] কমনওয়েল্থ যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেইসব সিদ্ধান্ত ভারত মেনে নিতে বাধ্য নয়। অর্থাৎ ভারতের সার্বভৌম মর্যাদায় আঘাত লাগার মতো কোনো সিদ্ধান্ত ভারত যেমন মানে না, তেমনই সার্বভৌম মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ কোনো সিদ্ধান্ত ভারত গ্রাহ্য করে না। ভারতের স্বাধীন চিন্তার ওপর কমনওয়েল্থ কোনো আইনগত বাধ্যতা আরোপ করতে পারে না। নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র যেমন—অভ্যন্তরীণ নীতি রচনা ও রূপায়ণ এবং বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভারত সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন।

India is a part of Commonwealth of Nations. So is India sovereign? Yes. 1) membership is voluntary. 2) Decisions of CWN is not binding on India

সমাজতান্ত্রিক Socialist

Term is vague and controversial. Socialism– No private ownership, Community ownership. We have democratic socialism – state would take the responsibility to eradicate poverty, remove inequality to foster economic progress and prevent growth of monopoly.

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বর্ণিত 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি মূল সংবিধানে উল্লেখ করা হয়নি। 1976 খ্রিস্টাব্দে 42 তম সংবিধান সংশোধনী দ্বারা এই শব্দটি প্রস্তাবনায় সংযুক্ত হয়। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ভারতে এই ধরনের গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রতিফলন ঘটেছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য ভারতে সমাজতান্ত্রিক ধারণাটি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। এমনকি বৈজ্ঞানিক ও মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের ধাঁচের সমাজকাঠামো গড়ে তোলার কোনো উদ্যোগ ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নেওয়া হয়নি। বরং জনকল্যাণকে কার্যকর বা বাস্তবায়িত করার জন্য মিশ্র অর্থনৈতিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থা গঠনের জন্য তৎপর হয়েছে সংবিধান প্রণেতাগণ। এর দ্বারা যাতে সম্পদের সুষম বণ্টন করা যায়, তার দিকেও বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়েছে।

ভারতের সমাজতন্ত্র—"নিজস্ব ধরনের সমাজতন্ত্র"। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা অন্য কোনো ধরনের সমাজতন্ত্র ভারতে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। ভারতের উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি বা উৎপাদনের উপায়গুলি একদিকে যেমন ব্যক্তিমালিকানার দ্বারা পরিচালিত অন্যদিকে তেমনই জাতীয়করণের বিষয়টিও বেশ জোরালো। অর্থাৎ জাতীয়করণ ও ব্যক্তিমালিকানা উভয় প্রকার মালিকানাই সংবিধান স্বীকৃত। অবশ্য সংস্কার ও আইন প্রণয়ন করে সমাজতন্ত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষ Secular

Equal respect for all religion. Separation of religion from State. Treat all religion equally. No official state religion. No one is discriminated on the basis of religion.

ভারতের মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি সংযুক্ত ছিল না। 1976 খ্রিস্টাব্দের 42 তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা এই শব্দটি প্রস্তাবনায় যুক্ত হয়। মূল সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি সংযোজিত না হলেও ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত ধর্মীয় স্বাধীনতার (25 থেকে 28 নং ধারা) মধ্যে এই নীতিটি নিহিত ছিল। ভারতের এই ধর্মনিরপেক্ষতার চরিত্রটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির। কারণ, ভারতের রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে কোনো ধর্ম নেই। ভারত কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের পক্ষে নয়; আবার ধর্মপ্রচারের জন্য ভারত কাউকে অর্থদান করবে না। ভারত মূলত নির্দিষ্ট কোনো ধর্মমতের পক্ষপাতিত্ব করে না। যেহেতু ধর্ম প্রতিটি মানুষের বিবেক ও বিশ্বাস দ্বারা আচ্ছাদিত; তাই, সেখানে রাষ্ট্রের কোনো হস্তক্ষেপ নেই। এদিক থেকে ভারত হল একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ ভারতে বসবাস করে। কোনো একটি বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করলে একদিকে যেমন সামাজিক শান্তির বিঘ্ন ঘটবে অন্যদিকে তেমনই জাতীয় সংহতিও বিনষ্ট হবে।

'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি দ্বারা এ কথা বোঝায় না যে, ভারত বিশেষ কোনো ধর্মের বিরোধী, আবার এ কথাও বোঝায় না যে, ভারতে ধর্মের কোনোরূপ স্থান নেই। আসলে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, ভারতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ সমভাবে নিজ নিজ ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা ভোগ করতে ও ধর্মাচারণ করতে পারে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র সকলের প্রতি সমান মনোভাব পোষণ করবে।

গণতান্ত্রিক Democratic

• Govt of the ppl, for the ppl, by the ppl.
• Universal Adult franchise ensures participation of ppl.
• Representative democracy.
• Media and civil society plays imp role.
• RTI (2005) keeps check on govt power.

'গণতন্ত্র' শব্দটি সংকীর্ণ ও ব্যাপক—উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সংকীর্ণ অর্থে 'গণতন্ত্র' হল এমন একটি শাসনব্যবস্থা, যেখানে জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত শাসকগোষ্ঠী বা সরকারের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে 'গণতন্ত্র'-কে একটি শাসনকাঠামো হিসেবেই শুধু পরিগণিত করা হয় না—একইসঙ্গে নাগরিকের জীবনযাপনের ধরনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল বিষয়ই গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

সংবিধানের প্রস্তাবনায় বর্ণিত 'গণতন্ত্র' শব্দটি ভারতে ব্যাপক অর্থে গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে গণতন্ত্রকে কোনো রাষ্ট্রীয় কাঠামো বা সরকারের ধরন বলে উল্লেখ করা ভুল হবে। কারণ, বর্তমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনযাপন দ্বারা 'গণতন্ত্র' ধারণাটি সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, জন্মস্থান, জাতপাত প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধিগুলি নিরসনের তথা সামাজিক বৈষম্যের অবসানের জন্য গণতন্ত্রের প্রয়োজন আছে। গণতন্ত্রই সমাজের সকল মানুষকে সমমর্যাদায় ঘোষিত করে। ভারতের সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির কথা বলা যায়। তা ছাড়া, ভারতের জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার গঠন ও পরিচালন সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের দ্বারা জনগণ এই সরকার গঠনে তৎপর।

সাধারণতন্ত্র Republic

• No hereditary monarch.
• Head of the state is neither nominated nor hereditary but is directly elected representative of ppl even though election may be indirect for a fixed period of time.

যখন কোনো দেশের সরকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণ দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে আইনগত ও রাজনৈতিক কার্যাবলির জন্য যথাক্রমে জনপ্রতিনিধি ও জনসাধারণের কাছে দায়বদ্ধ থাকে, তখন সেই শাসনব্যবস্থাকে বলা হয় 'সাধারণতান্ত্রিক' বা 'প্রজাতান্ত্রিক' শাসনব্যবস্থা। এরূপ শাসনব্যবস্থায় বংশানুক্রমিক শাসননীতি অনুপস্থিত থাকে।

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি 'সাধারণতন্ত্র' বলে অভিহিত করা হয়েছে। ভারতে বংশানুক্রমিক সরকার প্রতিষ্ঠিত নেই। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই সরকার গঠিত হয়। ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি, তিনি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ভারতে সরকার তার ক্রিয়াকলাপের জন্য দু-ভাবে দায়িত্বশীল থাকে—জনপ্রতিনিধিদের কাছে এবং জনগণের কাছে। ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার একটি নির্দিষ্ট সময়ে জন্য নির্বাচিত হন। তবে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারের মন্ত্রিগণ সংবিধান ভঙ্গ করলে বা কোনো গর্হিত কাজ করলে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পদচ্যুত করা যায়।

মূল্যায়ন: ভারতের সংবিধানে যে মূলনীতিসমূহ বর্ণিত হয়েছে তা বাস্তবায়িত হলে জনকল্যাণের এক সর্বোজ্জ্বল মহিমা বাস্তবায়িত হবে। এর জন্য প্রয়োজন—জনগণের মধ্যে এক প্রাণ, এক জাতি ও এক আদর্শের প্রতিষ্ঠা। এরূপ আদর্শের সংকল্পের কথাই প্রস্তাবনার মূলনীতিসমূহে ধ্বনিত হয়েছে। সুতরাং, বলা যায় প্রস্তাবনাটি সংবিধানের প্রাণস্বরূপ; সংবিধানকে একনজরে বুঝে নেওয়া ও এর মর্মবস্তু উপলব্ধি করার মূল বিষয়টি সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে প্রকাশ পেয়েছে। এর দ্বারা জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন 3 ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। Importance of Preamble

উত্তর

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার তাৎপর্য

ভারতের সংবিধানে বর্ণিত প্রস্তাবনাটি দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে সংবিধানের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা। মূলত, সংবিধানের সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর জন্য প্রস্তাবনাটি সংযোজিত। প্রস্তাবনায় বর্ণিত বিষয়গুলি দ্বারা জনগণের সার্বভৌমিকতার

মূলসূত্রটি ধ্বনিত হয়েছে। সরকার পরিচালনার কোনো বিষয় কিংবা সংবিধানের ধারাগুলিকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধ প্রস্তাবনায় বর্ণিত হয়নি। অর্থাৎ, সংবিধানের বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রস্তাবনাটি সংশ্লিষ্ট নাহলেও এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

আইনগত তাৎপর্য

প্রস্তাবনাকে সংবিধানের কার্যকরী অংশ বলা যায় না। সংবিধান হল একটি আইনগত দলিল। প্রস্তাবনাটি এই দলিলের পূর্বে সংযোজিত হয়েছে। তথাপি বলা যায় যে, যদি সংবিধানের কার্যকরী অংশের ব্যাখ্যা দানকালে কোনো শব্দ বা বাক্যের অর্থ স্পষ্ট না হয় তাহলে সেই শব্দ বা বাক্যের অস্পষ্টতা দূরীকরণের জন্য প্রস্তাবনার সাহায্য নেওয়া যায়। তবে যেসব ক্ষেত্রে সংবিধানের অর্থ বা শব্দ বা বাক্য স্পষ্ট, সেখানে প্রস্তাবনা দ্বারা ওই কার্যকরী অংশকে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। সংবিধানের কার্যকরী অংশ দ্বারা সরকার গঠন, পরিচালনা, সরকারের এক্তিয়ার প্রভৃতি নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়। কিন্তু সংবিধানের প্রস্তাবনায় যেসব নীতি ঘোষিত হয়েছে, তা কার্যকর করা সরকারের ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

রাজনৈতিক তাৎপর্য

যে সকল উদারনৈতিক ভাবধারা, বিবর্তনবাদী ও মিশ্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংবিধান রচয়িতাদের প্রভাবিত করেছিল, তারই প্রতিফলন ঘটেছে সংবিধানের প্রস্তাবনায়। তাঁরা চেয়েছিলেন ভারতকে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করতে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় তার দিকে তাঁরা দৃষ্টিপাত করেছিলেন। তাই প্রস্তাবনার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে জনগণের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের কথা এরই পাশাপাশি ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোর আদর্শ, রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহ এবং নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণের অধিকারও প্রকাশিত হয়েছে। জনগণ দ্বারা জনগণের সরকার গঠন, নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগঠন ও ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখা, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার অঙ্গীকার, সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষার অধিকার প্রভৃতি সংবিধানের রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করে। প্রস্তাবনায় বর্ণিত 'সার্বভৌম' শব্দটি দ্বারা কেবল রাষ্ট্রীয় অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ক্ষমতাকেই প্রকাশ করে না—এর দ্বারা গণসার্বভৌমিকতার ধারণাটিও প্রকাশ পেয়েছে।

সামাজিক তাৎপর্য

প্রস্তাবনা দ্বারা সামাজিক ন্যায়নীতির বিষয়টিও প্রকাশিত হয়েছে। সংবিধানের মূল অংশে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা, নারীদের সুযোগসুবিধা দান, শিশুদের অধিকারের সযত্ন-সংরক্ষণ, নারী-পুরুষের সমমজুরি ব্যবস্থা চালু করা, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রদান প্রভৃতি যে সামাজিক ন্যায়নীতি ঘোষিত হয়েছে, তা প্রস্তাবনায় বর্ণিত 'ন্যায়বিচার' (justice) শব্দটি দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

সংবিধানের প্রস্তাবনায় অর্থনৈতিক ন্যায় সংক্রান্ত বিষয়টি ঘোষিত হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাস্তব কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। তবে প্রস্তাবনায় বর্ণিত 'অর্থনৈতিক' শব্দটি এমনভাবে ব্যক্ত হয়েছে, যার দ্বারা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অর্থনৈতিক অবিচার থেকে মুক্তির জন্য এক সংগ্রামী পথ গ্রহণ করার অনুপ্রেরণা লাভ করবে। সম্পদের যাতে কেন্দ্রীকরণ না ঘটে, যাতে জাতীয় সম্পদের সুষম বণ্টন হতে পারে, কাজের যথাযথ পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে এবং জীবনযাত্রার মান গড়ে উঠতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখার অঙ্গীকার প্রস্তাবনায় ঘোষিত হয়েছে।

আদর্শগত তাৎপর্য

প্রস্তাবনা দ্বারা ভারতের সংবিধানের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শ প্রকাশিত হয়েছে। কীভাবে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে জনকল্যাণ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, তার আদর্শগত

ভাবটি প্রকাশিত হয়েছে প্রস্তাবনার মধ্যে। প্রস্তাবনার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে সংবিধান প্রণেতাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও চিন্তাধারা। অন্যভাবে বলা যায়, যে কার্যধারা সংবিধানের মূল অংশে বিভিন্ন ধারার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই মূল্যবোধ ও চিন্তাধারাই ব্যক্ত হয়েছে প্রস্তাবনার মধ্যে।

উপসংহার: সংবিধানের কার্যকরী অংশের একটি সারাংশ হল সংবিধানের প্রস্তাবনা। ক্ষমতাসীন সরকারের দায়বদ্ধতা হল জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠা। এই কার্য সম্পাদনের জন্য গণতান্ত্রিক ন্যায় ও সামাজিক ন্যায়ের ধারা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে সরকার। নৈতিক দিক থেকে তাই জনকল্যাণের মূলসূত্রটি প্রস্তাবনার মধ্যে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রস্তাবনার নৈতিক গুরুত্বও অপরিসীম।

ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি (Justice, Liberty, Equality, Fraternity etc.)

ন্যায় (Justice)

সংবিধানের প্রস্তাবনায় **সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা** বলা হয়েছে। সংবিধানের ১৭ নং ধারায় **অস্পৃশ্যতা আচরণ ও প্রচার নিষিদ্ধ** ক'রে সামাজিক ক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট ভেদনীতির বিরুদ্ধে সংবিধান-রচয়িতারা সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তা ছাড়া, সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত সরকার **জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের আদর্শসমূহ** গ্রহণ করেছে। সর্বোপরি, **সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থা** গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্র-পরিচালনার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নীতিকে সংবিধানের চতুর্থ অংশে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত না হলে সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব—এই সত্যটি সংবিধান-রচয়িতাগণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁরা সংবিধানের চতুর্থ অংশে **অর্থনৈতিক আদর্শ সম্পর্কিত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি** লিপিবদ্ধ করেছিলেন। **অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ, সর্বসাধারণের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টন, নাগরিকদের কর্ম ও শিক্ষার ব্যবস্থা** গ্রহণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান কাজের জন্য **সমান মজুরি প্রদান, শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ** প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারের কর্তব্য বলে ওইসব নির্দেশমূলক নীতিতে বলা হয়। **রাজনৈতিক ক্ষেত্রে** ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ, ইত্যাদি নির্বিশেষে সব প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক ভারতীয় নাগরিককে **সমানভাবে ভোটাধিকার** প্রদান করা

হয়েছে। তা ছাড়া, তপশিলি জাতি ও উপজাতির মতো সংখ্যালঘুদের জন্য নির্বাচনে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে দাবি করা হয়।

কিন্তু বাস্তবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায় যে, স্বাধীনতালাভের পর ভারতে বুর্জোয়া-জমিদার শাসন কায়েম হওয়ার ফলে সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য-বৈষম্য থাকায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। তাই বর্ণ-বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা প্রভৃতি পুঁজিবাদের সহজাত কুফলগুলি জনজীবনকে বিপর্যস্ত ক'রে তুলেছে এবং ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে।

স্বাধীনতা (Liberty)

প্রস্তাবনায় নাগরিকদের চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত 'স্বাধীনতার অধিকার' (১৯-২২ নং ধারা) এবং 'ধর্মের অধিকার' (২৫-২৮ নং ধারা) প্রদান করে প্রস্তাবনায় বর্ণিত ভারতীয় নাগরিকদের স্বাধীনতাকে বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নানাপ্রকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ এবং অর্ডিন্যান্স ও আইন প্রণয়ন করে ওইসব স্বাধীনতার অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে বলে সমালোচকদের অভিমত। বিশেষত, ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি ক'রে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার কার্যত নাগরিকদের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা খর্ব করেছিল।

সাম্য (Equality)

সাধারণভাবে সাম্য বলতে প্রত্যেকের সমান সুযোগসুবিধা লাভের অধিকারকে বোঝায়। প্রস্তাবনায় মর্যাদা ও সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার যে-কথা বলা হয়েছে, তাকে সংবিধানের ১৪-১৮ নং ধারার মাধ্যমে কার্যকর করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়। কিন্তু ভারতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনিক-বণিকশ্রেণির প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বিদ্যমান থাকার ফলে মর্যাদা ও সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে তারাই অগ্রাধিকার লাভ করে।

ভ্রাতৃত্ববোধ (Fraternity)

ভারতের মতো বিশাল দেশে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষ বসবাস করে। তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ভিন্নতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এদের সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে দেশের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হবে। তাই প্রস্তাবনায় ভ্রাতৃত্ববোধ সম্প্রসারণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হল—মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় সংহতি রক্ষার কথা বলা ছিল না। ১৯৭৬ সালে ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই শব্দটি সংযোজন করা হয়েছে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতে এক-নাগরিকত্ব ব্যবস্থা যেমন বর্তমান রয়েছে, তেমনি আবার সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ প্রভৃতির ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করার ফলে সব নাগরিক সমানভাবে মৌলিক অধিকার ভোগ করতে সক্ষম। তা ছাড়া, সংবিধানের ৪(ক) অংশে 'ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ' করাকে অন্যতম মৌলিক কর্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য হল ভারতবাসীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করা। একই সঙ্গে বিশ্বভ্রাতৃত্বের এই সুমহান আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে ভারতীয় সংবিধানের ৫১ নং ধারার মধ্যে। এই ধারায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার উন্নতি-বিধান, জাতিসমূহের মধ্যে ন্যায়সংগত ও সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপন, আন্তর্জাতিক আইন, সন্ধি প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সালিশির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তিকরণের কথা বলা হয়েছে।

ব্যক্তির মর্যাদা (Dignity of the Individual)

ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার সব প্রয়াস ব্যর্থ হবে যদি ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা না করা হয়। তাই প্রস্তাবনার মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষার জন্য সংবিধানে প্রত্যেককে মৌলিক অধিকার ভোগের সমান অধিকারই কেবল প্রদান করা হয়নি, সেই অধিকার ভঙ্গের বিরুদ্ধে ধনী-দরিদ্র, অভিজাত-অভাজন, স্ত্রী-পুরুষ এবং উচ্চ-নীচ জাত নির্বিশেষে যে-কোনো ব্যক্তি আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে।

তা ছাড়া, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য ও বৈষম্য বর্তমান থাকলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষের কাছে মর্যাদা রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই সংবিধানের চতুর্থ অংশে লিপিবদ্ধ রাষ্ট্রপরিচালনার কয়েকটি নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমান কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান ; শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বিশ্রামভোগ এবং সামাজিক ও কৃষ্টিগত সুযোগ-সুবিধাদানের মাধ্যমে কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টি ; অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ ; দুর্বল ও অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলিকে সামাজিক অবিচার ও সর্বপ্রকার শোষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

জাতীয় ঐক্য ও সংহতি (Unity and Integrity of the Nation)

সংবিধানের প্রস্তাবনায় জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু কায়েমি স্বার্থবাদীদের চক্রান্তে আজ জাতীয় ঐক্য ও সংহতি ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রভৃতি ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। এইসব অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে সকল দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশীল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে আপসহীন সংগ্রাম চালাতে হবে। এই সংগ্রাম কেবল জাতীয় ক্ষেত্রে পরিচালনা করলেই চলবে না, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাকে সম্প্রসারণ করতে হবে।

উপসংহার (Conclusion)

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা স্বদেশে ও বিদেশে বহু প্রথিতযশা ব্যক্তির দ্বারা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। **আর্নেস্ট বার্কার** (Ernest Barker) ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটিকে তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ *প্রিন্সিপল্‌স্ অব সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল থিওরি (Principles of Social and Political Theory)*-র মূলসূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "এই প্রস্তাবনাটি উদ্ধৃত করতে আমি গর্ববোধ করছি এই কারণে যে, ...ভারতের জনগণ তাদের স্বাধীন জীবন শুরু করেছে এমন একটি রাজনৈতিক ঐতিহ্যকে আশ্রয় ক'রে, যা আমরা, পশ্চিমের লোকেরা, 'পশ্চিমি' বলে থাকি। কিন্তু সেটি আজ 'পশ্চিমি'র চেয়েও বেশি কিছু।" এরূপ স্বীকৃতির মাধ্যমেই প্রস্তাবনার মধ্যে ভারতীয় সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তিটি খুঁজে পাওয়া যায়। বার্কার ছিলেন 'সংশোধনমূলক উদারনীতিবাদ'-এর অন্যতম প্রধান প্রবক্তা। তিনি তাঁর সংশোধনমূলক উদারনৈতিক তত্ত্বের প্রধান দিকগুলি ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই এই প্রস্তাবনাকে সংশোধনমূলক উদারনীতিবাদের তথা বিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া দর্শনের তত্ত্বগত ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

সংবিধানের প্রস্তাবনা কি সংশোধনযোগ্য? (Is the Preamble to the Constitution Amendable?)

তীব্র মতবিরোধ

সংবিধানের ৩৬৮ নং ধারা অনুযায়ী প্রস্তাবনা সংশোধনযোগ্য কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। এমনকি, সুপ্রিমকোর্টও বিভিন্ন মামলায় বিভিন্ন ধরনের রায় দিয়েছে। এরূপ হওয়ার প্রধান কারণ হল—প্রস্তাবনা সংবিধানের কার্যকরী অংশের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় আইনগত দিক থেকে এর বিশেষ কোনো মূল্য নেই। এমনকি, প্রস্তাবনার সঙ্গে সংবিধানের মূল অংশের বিরোধ দেখা দিলে আদালত বিভিন্ন মামলায় প্রস্তাবনার পরিবর্তে সংবিধানের মূল অংশকেই গ্রহণ করেছে। কিন্তু সংবিধানের ৩৬৮ নং ধারা অনুযায়ী প্রস্তাবনা সংশোধনযোগ্য কি না—কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য মামলায় (১৯৭৩) সুপ্রিমকোর্টের কাছে এই প্রশ্নটি সর্বপ্রথম উত্থাপিত হয়। ওই মামলায় আবেদনকারীর মূল বক্তব্য ছিল ৩৬৮ নং ধারায় প্রদত্ত সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা সীমাহীন নয়। এরূপ ক্ষমতার ওপর প্রস্তাবনা অনুমিত সীমাবদ্ধতা (implied limitation) আরোপ করেছে। কারণ, প্রস্তাবনার মধ্যে ভারতীয় সংবিধানের প্রাথমিক উপাদানগুলি (basic elements) বা মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি (fundamental features) লিপিবদ্ধ করা রয়েছে। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সেগুলির ক্ষতিসাধন বা ধ্বংসসাধন আদৌ করা যায় না। তা ছাড়া, প্রস্তাবনা যেহেতু

সংবিধানের অংশ নয়, সেহেতু ৩৬৮ নং ধারার মাধ্যমে তা সংশোধনযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। কারণ, এই ধারাটি কেবল সংবিধান সংশোধনের সঙ্গেই যুক্ত। ১৯৬০ সালে বেরুবাড়ি মামলায় সুপ্রিমকোর্টও অনুরূপ রায় দিয়েছিল। কিন্তু কেশবানন্দ ভারতী মামলায় অ্যাটর্নি জেনারেল আবেদনকারীর বক্তব্যের বিরোধিতা ক'রে এই যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, ৩৬৮ নং ধারায় লিপিবদ্ধ সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে পার্লামেন্ট প্রস্তাবনাকেও সংশোধন করতে সক্ষম। কারণ, প্রস্তাবনা হল সংবিধানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই এই ধারার মাধ্যমে সংবিধানের অন্যান্য অংশের মতোই প্রস্তাবনাকেও সংশোধন করা যায়।

সুপ্রিমকোর্টের ঐতিহাসিক রায়

কেশবানন্দ ভারতী মামলায় প্রদত্ত ঐতিহাসিক রায়ে সুপ্রিমকোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতি এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, বেরুবাড়ি-সংক্রান্ত বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টের অভিমত ভ্রান্ত ছিল। কারণ, সংবিধানের অন্যান্য অংশের মতো প্রস্তাবনাও তার একটি অংশ। তাঁদের মতে, সংবিধানের ৩৬৮ নং ধারার প্রয়োগ ঘটিয়ে প্রস্তাবনার সংশোধন করা গেলেও এর 'মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি' (basic features)-কে কোনোভাবেই সংশোধন করা যায় না। কারণ, "আমাদের সংবিধান রূপ অট্টালিকা প্রস্তাবনায় উল্লিখিত মৌলিক উপাদানগুলির ওপর ভিত্তি ক'রেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। এইসব উপাদানের কোনো একটিকে যদি অপসারণ করা হয়, তাহলে সাংবিধানিক কাঠামোটির অস্তিত্বই বিপন্ন হবে।" সুপ্রিমকোর্টের মতে, এরূপ করা হলে ভারতীয় সংবিধান তার আদি রূপ কিংবা স্বকীয় পরিচিতি হারিয়ে ফেলবে। প্রস্তাবনায় এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভারতের জনগণ তাদের দেশকে একটি 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সংকল্প গ্রহণ করেছে। কেউই এ কথা বলতে পারবেন না যে, এইসব শব্দ ও অভিব্যক্তি (words and expression)-র মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে। তাই পার্লামেন্টের হাতে প্রদত্ত সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতাকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না, যার ফলে সংবিধানের প্রস্তাবনায় লিপিবদ্ধ এইসব নীতির মৌলিক ও মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিনষ্ট করা যায়।

৪২-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনার পরিবর্তন

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৭৬ সালে ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনার মধ্যে 'সমাজতান্ত্রিক', 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং 'সংহতি' শব্দ তিনটি সংযোজিত হয়। ওই সময় ভারতের বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্নতাবাদী অশুভ শক্তির আবির্ভাব ও বিকাশের ফলে ভারতের জাতীয় সংহতি যেমন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তেমনি সাম্প্রদায়িক শক্তির আবির্ভাবের ফলে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার সুমহান আদর্শ বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল। তাই এই সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনার সংশোধন ঘটিয়ে এইসব মৌলিক নীতিকে প্রস্তাবনায় সংযোজন করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে কেশবানন্দ ভারতী মামলায় সুপ্রিমকোর্টের প্রদত্ত রায়ের বিরোধিতা তো করাই হয়নি, বরং তাকে মেনে নেওয়া হয়েছিল। কারণ, ওই রায়ে উল্লিখিত সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে অন্য কয়েকটি অনুরূপ বৈশিষ্ট্য প্রস্তাবনার মধ্যে সংযোজিত হয়েছিল। নতুন সংযোজিত তিনটি আদর্শ ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন অংশে প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান ছিল। পূর্বোক্ত সংশোধনের মাধ্যমে সেগুলিকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় মাত্র। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রস্তাবনায় 'অর্থনৈতিক ন্যায়' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণার মাধ্যমে ভারতের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের অঙ্গীকার গ্রহণের কথাই বলা হয়েছে। আবার, সংবিধানের চতুর্থ অংশে বর্ণিত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক আদর্শ সম্পর্কিত নীতিগুলি, বিশেষত ৩৯(খ) ও ৩৯(গ) নং ধারায় বর্ণিত নীতিটি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথাই বলেছে। এক্সেল ওয়্যার বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায় (১৯৭৯) সুপ্রিমকোর্ট এই অভিমত ব্যক্ত করেছিল যে, প্রস্তাবনায় 'সমাজতন্ত্র' কথাটির সংযোজন আদালতসমূহকে শিল্পের জাতীয়করণ এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠার সপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। আবার, ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের মধ্যে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটিকে প্রস্তাবনায় সংযোজন করা হলেও এই প্রস্তাবনায় 'বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা' এবং ২৫-২৮ নং ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার জনগণকে প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যে-তিনটি মৌলিক নীতি বা আদর্শ সংবিধানের প্রস্তাবনায় সংযোজিত হয়, সেগুলি প্রস্তাবনা এবং সংবিধানের বিভিন্ন অংশে ইতস্তত-বিক্ষিপ্তভাবে বর্তমান ছিল। পূর্বোক্ত সংশোধনের মাধ্যমে সেগুলিকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে প্রস্তাবনার মধ্যে স্থান প্রদান করা হয় মাত্র।